নজরুল-সাহিত্যের ভাষা-বৈশিষ্ট্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ*

১. ভূমিকা

কবিতার দৈহিক কাঠামো নির্মাণে ও প্রসাধনকলা রূপায়ণে শব্দ ব্যবহারের গুরুত্ব সর্বাধিক। কবিতার রূপকল্প নির্দেশে অধিকাংশ সময় রূপক, অনুপ্রাস, চিত্রকল্প বা ছন্দের দিক প্রাধান্য পেলেও শব্দ বা বৃহত্তর অর্থে ভাষা প্রয়োগের আনুষঙ্গিক দিক বা অন্য অর্থে স্টাইলিস্টিকস আলোচিত হয় না বলে ভাষা নির্মাণের অন্তর্নিহিত কৌশল নেপথ্যে অবস্থান করে। শব্দ ব্যবহারে ধ্বনির পারস্পরিক বিন্যাস, অনুরণন ও স্বরতরঙ্গের দিক অনুসৃত হয়ে থাকে। একজন কবি কবিতার অবয়ব নির্মাণে শব্দ-গঠনের এই দিকগুলি সচেতনভাবে চিন্তা করেন বলে তাঁর কবিতা ও সাহিত্য বিশ্লেষণে সাহিত্যের রূপগত এই বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে ভাষা সম্পর্কে কবি-চেতনার বিশেষ মনোভঙ্গি মূর্ত হয়ে ওঠে।

নজরুল ইসলাম ভাষা-সচেতন শিল্পী। তাঁর সাহিত্যে বাক্যদেহ নির্মাণ, শব্দ ব্যবহার ও নতুন শব্দ গঠন, ধ্বনিব্যঞ্জনা, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ও আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের প্রাচুর্য ভাষা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার দিক নির্দেশ করে। তাঁর সাহিত্যে ব্যবহৃত তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ ব্যবহারের রীতি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এজন্যে যে, সাহিত্যের গঠনগত রূপ-নির্মাণের সঙ্গে শব্দ-ব্যবহারে কবির শিল্প দক্ষতার পরিধি অনাবৃত হয়ে চিনতে সহায়তা করে। গদ্য সাহিত্য , বিশেষত কবিতায় শব্দের বিভিন্ন উপাদান লক্ষ্য করলে শব্দের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। একটি শব্দের দ্বিধারিক অর্থ ক্রিয়াশীল থাকে – আভিধানিক অর্থ, যা নির্দিষ্ট এবং পরিবেশগত অর্থ, যা অনির্দিষ্ট। কবিতার নিম্নস্তরে শব্দের প্রচলিত অর্থ নির্দেশিত হয় আর উচ্চস্তরে প্রচলিত অর্থের বাইরে গিয়ে কবি ভিন্ন অর্থের সন্ধান করেন। কবিতায়

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শব্দের মধ্য দিয়ে স্তবক নির্মিত হলেও শব্দের ধ্বনিব্যঞ্জনার একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে, যা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চগ্রাম ও নিম্নগ্রামের মধ্য দিয়ে নির্দেশের চেষ্টা করা হয়।

২. কবিতা

কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম থেকেই ভাষা-সচেতন কবি ছিলেন। সেজন্য তাঁর কবিতায় শব্দ ও ধ্বনি ব্যবহারের বৈচিত্র্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেভাবে কবিতায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন তা সংক্ষেপে এখানে নির্দেশ করা যায়।

ক. আঞ্চলিক শব্দ :

কও (খোকার খুশী)
টাঙতে (খাঁদু দাদু)
ক্যান (বোক-চন্দর)
লিখতেছি (চিঠি)

খ. বিদেশি শব্দ :

তোফা (খোকার গল্প বলা)
মশগুল (ঝিঙেফুল)
আসমানে (ঐ)
লোহু (শাত-ইল-আরব)

গ. সাধুরীতির শব্দ :

যাহা (মা)
কেহ, পাইবে (মা)
ত্যাজি (প্রভাতী)
সুধাংশু (খাঁদু দাদু)

ঘ. গঠিত/অগঠিত শব্দের বিশেষ প্রয়োগরীতি :

ঘুমু যাও (ঝিঙেফুল)
ঠমকি ছমকি (বিদ্রোহী)
সকলগুলো (খুকী ও কাঠবেরালী)
বোক-চন্দর (খোকার বুদ্ধি)

শব্দে অক্ষর ভাগ

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের কাঠামো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এগুলো এক বা একাধিক অক্ষর, সমন্বয়ে গঠিত। অধিকাংশ কবিই একাধিক অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এর কারণ, একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের অর্থে সীমাবদ্ধতা না থাকলেও ব্যঞ্জনা সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায় না। নজরুলের কবিতায় একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের ব্যবহার সহজেই লক্ষণীয়।

ক. একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ :

বর (খোকার খুশী)
শোন (ঐ)

খ. দু অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ :

নদী (শিশু যাদুকর)
মন্মথ (ঐ)
ঝুমকো (ঝুমকো লতার জোনাকি)

গ. তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ :

হুংকারে খোকার বুদ্ধি)
হিমাদ্রির (বিদ্রোহী)

ঘ. চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ :

মহাকল্লোল (বিদ্রোহী)
মশারীতে (ঘুম-পাড়ানী গান)

ঙ. পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ :

রক্তাম্বরধারিণী (রক্তাম্বরধারিণী মা)

নজরুলের কবিতায় মুক্ত শব্দ, বদ্ধ শব্দ, সম্প্রসারিত শব্দ ও সাধিত শব্দ – এই চার শ্রেণীর শব্দই ব্যবহৃত। যেমন :

ক. মুক্ত শব্দ :

পেয়ারা (খুকী ও কাঠবেরালী)

বর (খোকার খুশী)

খ. বদ্ধ শব্দ :

সন্ধানীরা (সংকল্প)

শালিকগুলোর (ফ্যাসাদ)

গ. সম্প্রসারিত শব্দ '

পেটে (খুকী ও কাঠবেরালী)

কেদারাতে (খোকার গপ্প বলা)

ঘ. সাধিত শব্দ :

আকুলতা (মা)

জল-দেউড়ি (চলব আমি হালকা চালে)

নজরুলের বিদ্রোহমূলক কবিতায় অধিকতর তদ্ভব শব্দ ব্যবহারে গাম্ভীর্য ও ভাবাবেগ সৃষ্টি করার প্রয়াস লক্ষণীয়। যেমন :

উঠিয়াছি চির -বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !'

চরণের প্রথম দিকে একাধিক শব্দে মুক্তাক্ষর ব্যবহারের পর বদ্ধাক্ষর ব্যবহারে তীব্রতর প্রবহমানতা বিদ্যমান। এখানে 'উঠিয়াছি' ও 'চির' মুক্তাক্ষরের পর 'বিষ্ময়' বদ্ধাক্ষর এবং 'মম' ও ললাটের'র পর 'রুদ্র' বদ্ধাক্ষর ব্যবহারের প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে। বিদ্রোহমূলক কবিতার তুলনায় প্রেমমূলক কবিতায় সাধারণভাবে তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশি.যদিও কোন কোন কবিতায় ভাব-গাম্ভীর্যের প্রয়োজনেই তদ্ভব শব্দ ব্যবহৃত। উদাহরণ হিসাবে 'পূজারিণী' কবিতার নামোল্লেখ করা যায়।

কবিতায় শব্দ ব্যবহারে নজরুলের কৃতিত্ব হল বিভিন্ন কবিতায় স্বাধীনভাবে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার। বাংলা কবিতার এই প্রসাধনকলায় নজরুল ব্যতিক্রমধর্মী কবি। তিনি বাংলা শব্দের পাশে এমনভাবে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা বাংলা শব্দের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। যেমন, 'শাত-ইল-আরব' কবিতা :

কূত-আমারার রক্তে ভরিয়া

দজলা এনেছে লোহুর দরিয়া ;

'কোরবানী' কবিতা :

খঞ্জর মারো গর্দানেই,
পঞ্জরে আজি দর্দ নেই,
মর্দানীই পর্দা নেই,
ডরতা নেই আজ খুন-খারাবীতে রক্তলুব্ধ মন।

একই শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ব্যবহারে ও ধ্বনি-ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে নজরুল ছিলেন দক্ষ শিল্পী। 'মোহররম' কবিতায় ব্যবহৃত 'লাল' শব্দ তার উদাহরণ। যেমন :

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া—
আম্মা ! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।

বিদেশি শব্দ ব্যবহারে বাংলা কবিতার চরণ ও স্তবক নির্মাণে নজরুলের মত অন্য কোন কবি এতখানি সার্থকতা লাভ করেননি।

'র' ধ্বনি তরল ধ্বনি হওয়ায় এই ধ্বনি বারংবার ব্যবহারে কবিতায় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সম্ভব বলে নজরুল কবিতায় এই ধ্বনির ব্যবহারে দুর্বল ছিলেন। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রাহী', 'ধূমকেতু', 'আনোয়ার' এই চারটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলেই একথা স্পষ্ট হবে।

ক. প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর ! !
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়। ...
আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মহাকালের চণ্ড-রূপে –
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর !

খ. বিদ্রোহী

বল বীর –
বল উন্নত মম শির !

শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর!
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর,
আমি শাসন ত্রাশন সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।

গ. আনোয়ার

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার!
আনোয়ার! জিঞ্জির-
পরা মোরা খিঞ্জীর?
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোণা রিণ-ঝিন কির,-
নিবু-নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিনকির!

৩. কথাসাহিত্য

কবিতার মত নজরুল ইসলামের উপন্যাস, গল্প, নাটিকা ও প্রবন্ধের ভাষা-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে ভাব অনুযায়ী গদ্যরীতির ব্যবহার, চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী গদ্যের ভাষা নির্মাণ, আঞ্চলিক রীতির ব্যবহার এবং গম্ভীর ও ভাবানুভূতিমূলক গদ্যের ব্যবহারে নজরুলের সচেতন শিল্পীমন আবিষ্কার করা যায়।

নজরুলের 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'বাঁধন-হারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'য় সাধুরীতি, চলিত রীতি ও আঞ্চলিক রীতি ব্যবহৃত। এর মধ্যে শুধু 'কুহেলিকা' উপন্যাস সাধুরীতিতে লেখা। 'কুহেলিকা'র মধ্যে প্রেম প্রাধান্য পেলেও ব্রিটিশ ভারতে সন্ত্রাস আন্দোলনের দিকও কাহিনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত প্লটের গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্যে এই গ্রন্থ রচনায় নজরুল সাধু-রীতি নির্বাচন করেন। 'ব্যথার দান' আবেগ-নির্ভর রোমান্টিক কাহিনী আশ্রিত হওয়ায় ভাষায় চটুল ও আবেগপ্রবণ শব্দ ব্যবহারে বাক্যের দেহ নির্মিত। গদ্যের ছন্দোস্রোত ও আবেগ

প্রকাশে নজরুল কতখানি দক্ষ ছিলেন 'ব্যথার দান' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেমন :

"এ গোলা-বারুদের রঙে আসমান-জমিন লালে লাল হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি লাল ঐ বুকে 'বেয়নেট'- পোরা হতভাগাদের বুকের রক্ত! লালে লাল! শুধু লাল আর লাল! এক একটা সিপাই শহীদ হয়েছে, আর যেন বিয়ের নওশার মত লাল হয়ে শুয়ে আছে।"

'লাল' শব্দ ব্যবহারের প্রতি নজরুলের বিশেষ একটা মানসিক প্রবণতা বিদ্যমান। 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থে 'রিক্তের বেদন' অংশে একই ভাষা ব্যবহৃত হলেও বেশি আবেগময়। আবেগ প্রকাশে ভাষা ব্যবহারে তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি তৎসম শব্দ ব্যবহারেও তিনি অত্যন্ত কৌশলী। 'রিক্তের বেদন'-এর একটি অংশ উদ্ধৃত করলেই একথা স্পষ্ট হবে।

"তারপরেই আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লুম! ছুটে গিয়ে গুলের এলিয়ে-পড়া দেহলতা আমার চিরতৃষিত অতৃপ্ত বুকে বিপুল বলে চেপে ধরলুম। তারপর তার বেদনাস্ফুরিত ওষ্ঠপুট আমার পিপাসী ওষ্ঠ নিবিড়ভাবে সংলগ্ন করে আর্তকণ্ঠে ডাকলুম, 'গুল-গুল-গুল!' প্রবল একটা জলো হাওয়ার নাড়া পেয়ে সিউলি ঝরে পড়ার মত শুধু একরাশ ঝরা অশ্রু তার আমার মুখে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।"

উদ্ধৃত অংশে চলিত রীতিতে ব্যবহৃত শব্দের পাশে 'বেদনাস্ফুরিত ও ওষ্ঠপুষ্ট' ব্যবহার অসামঞ্জস হয়নি। দ্বিতীয়ত, কলকাতাবাসীদের ব্যবহৃত ক্রিয়ার শেষেউম প্রত্যয়ের ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন, ধরলুম, ডাকলুম।

৪. আঞ্চলিক রীতির ব্যবহার

নজরুলের গল্পা, উপন্যাস, নাটিকা ও কৌতুক-নকশায় সাধুরীতি ও চলিতরীতির শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি আঞ্চলিক রীতি ব্যবহারের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। তিনি আঞ্চলিক রীতি গ্রহণ করেছেন কাহিনীর পরিবেশ, চরিত্রস্ফুটন ও হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে। বিশেষ অঞ্চলের জীবনকাহিনী নির্মাণের সঙ্গে কাহিনী ও চরিত্র বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষারীতি ব্যবহৃত। উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটিকায় বীরভূমের বাগদীদের ভাষা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা, কৃষ্ণনগরের নিম্নবিত্ত মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিশ্চানদের স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত। এইসব অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে নজরুলের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তিনি

ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও কৃষ্ণনগরে কিছুকাল অতিবাহিত করার সময় এই দুটি অঞ্চলের স্থানীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। ঢাকাসহ বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন এবং এই এলাকার ভাষাভঙ্গি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান। নিজের জন্মভূমি বর্ধমান অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী বীরভূম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাও তাঁর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। 'রাক্ষুসী' গল্পে বীরভূমের বাগদীদের ভাষা, 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের স্থানীয় ভাষা, 'জিনের বাদশা' গল্পে ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষা ও 'অগ্নিগিরি' গল্পে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত। এখানে নজরুল অনুসৃত আঞ্চলিক ভাষার দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করা যায়। 'রাক্ষুসী' গল্প –

"আমি কোন উনোনমুখো সুঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন খালভরা ড্যাকরার মুখে আগুন দিয়েছি? কোন চোখখাগী আবাগী বেটির বুকে বসে তপ্তখোলা ভেঙেছি?"

'জিনের বাদশা' গল্প–

"তুমি যাই ভাব বেয়াই, আমি কইতাছি–এ গায়েবের খবর না, এ ঐ হালার পোলা আল্লা–রাখার কাজ। হালায় কোন ছাপাখানা থেইয়া ছাপাইয়া আনছে। জিনের বাদশা তোমারে ছাপাইয়া চিঠি দিব ক্যান? জিনের বাদশারে আমি সালাম করি। কিন্তু বেয়াই, এ জিনের বাদশার কাম না। ঐ হালার পো হালার কাম যদি না অয়, আমি পঞ্চাশ জুতা খাইমু।"

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস –

"এর চরম উত্তর দিল গজালের মা, বেশ একটা ছুরির মত ধারালো হাসি হেসে, 'বলি ওলো হুতমোচোখী, ঐ আমফেসাদ বাবু ত আমার তলপেটে চালের পোটলা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়েনি। ছেলের বেয়ারাম হয়েলো, তাই ওর বাড়ী চাকরী করতে গিয়েলাম, তাই বলে এক গেলাস পানি খেয়েছি ও বাড়ীতে?"

মেজ বৌ, প্যাঁকালে, কুর্সি, প্যাঁকালের মার মত চরিত্র এই শ্রেণীর ভাষার মধ্যে দিয়ে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'জিনের বাদশার' আল্লা–রাখা, চান ভানু, 'অগ্নি–গিরি'র সবুর ও নুরজাহান ফরিদপুর ও ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে দিয়ে কিশোর প্রেম ও বেদনার তীব্র কাতরতা প্রকাশের সঙ্গে গ্রামীণ পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'অগ্নি–গিরি' গল্প থেকে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার নমুনা এখানে উপস্থাপন করা যায়।

"সেদিন সন্ধ্যায় যখন পড়াতে গেল সবুর, তখন কোনো ভূমিকা না করে নুরজাহান বলে উঠল, আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইধলিশ পোলাপান যা তা কইব আর আপনি হুইন্যা ল্যাজ গুডাইয়া চইল্যা আইবেন? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছ্ছে না?"

এই শ্রেণীর আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত না হলে বাগদীর স্ত্রীর মত অন্যান্য চরিত্র নিজেদের পরিবেশে জীবন্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পেত না।

গল্প, উপন্যাস ছাড়াও নজরুলের নাটিকা ও কৌতুক-নকশায় বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত। 'পুতুলের বিয়ে' নাটিকায় কতকগুলো শিশু চরিত্রাঙ্কনে নজরুল ইসলাম একই সঙ্গে চলিত রীতি ও আঞ্চলিক রীতির প্রয়োগে চরিত্রের মানসিক প্রকৃতি ও রসিকতার প্রকৃতিও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে পঞ্চি চরিত্রের সংলাপ নির্দেশ করা যায়।

"পঞ্চি। কি কস। পঞ্চির বেডি অত হস্তা না। ওই চীনা অলম্বুসডারে জামাই করব নি। ওডা দেখবার যেমন ভূতের লাহান, নামও তেমিন রাখচে - ফুচুং। উহারে দেইহাই আমার মায়্যা এক্কুরে চিক্কুর পাইর‍্যা ফাল দিয়া উঠব। টুলি আপন বেডিরে দেয় না ক্যান?"

নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার বৈচিত্র্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় গল্প, নাটিকা ও হাসির গানে এই ভাষা ব্যবহারে। 'কলির কেষ্ট', 'কালোয়াতী কসরৎ', 'পুরনো বলদ নতুন বৌ', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

৫. প্রবন্ধ সাহিত্য

নজরুল ইসলামের গদ্য সাহিত্যের মধ্যে প্রবন্ধ, অভিভাষণ, চিঠিপত্র ও গ্রন্থ-সমালোচনা অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রবন্ধ সাহিত্যের ভাষা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে দু একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর প্রবন্ধ সাধু ও চলিত—এই দু রীতিতেই লিখিত। অপেক্ষাকৃত গুরু-গম্ভীর বিষয় সাধুরীতিতে লিখিত এবং আবেগনির্ভর ও লঘু বিষয়ে প্রবন্ধ চলিত রীতি আশ্রিত। অধিকাংশ অভিভাষণে চলিত রীতি ব্যবহৃত হলেও সাধুরীতি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি। তাঁর অধিকাংশ চিঠির ভাষা চলিতরীতি আশ্রিত এবং

কোন কোন ক্ষেত্রে কৌতুকপ্রবণ শব্দও ব্যবহৃত। যেমন, আফজাল-উল-হককে লিখিত চিঠিতে তাঁকে 'ডাবজল' বলে সম্বোধন।

ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবই বেশি প্রকাশিত হয়েছে সাধুরীতিতে রচিত প্রবন্ধে। সঙ্গীত বিষয়ক গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ সাধুরীতিতে প্রকাশ শ্রেয় বলে এই রীতি অনুসৃত। 'নবযুগ'- 'গেছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ!', 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' 'বাঙলা সাহিত্যে-মুসলমান', 'উপেক্ষিত শক্তির উদবোধন' 'মুখবন্ধ', 'রোজকেয়ামত বা প্রলয় দিন', 'বাঙালীর ব্যবসাদারী', 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন', 'কালা আদমীকে গুলি মারা', 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'সুর ও শ্রুতি'র মত অসংখ্য প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের ভাষা-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধে তৎসম শব্দের আধিক্য থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে তার সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এখানে 'ছুঁৎমার্গ' প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

"এখন কথা হইতেছে, আদত রোগ কোথায়? আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই চোঁয়াছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই।"

এই পর্যায়ের প্রবন্ধ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রবন্ধের ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যবহার হ্রাস পেয়ে সাধুরীতিতে সহজ বোধ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

নজরুল মূলত কবি ও গীতিকার ছিলেন বলে তাঁর গদ্য রচনায় কবিত্বের সযত্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গদ্যের ভাষারূপ নির্মাণে কবি-চেতনা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি' গ্রন্থ আলোচনায় ব্যবহৃত ভাষায় কাব্যিক মাধুর্য লক্ষণীয়। নিচের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করলেই এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

ভৈরব নদীর তীরে ঝাউতলায় নিরালায় বসে 'হারামণি' দেখছিলাম। মাথার উপর ঝাউশাখার করুণ মর্মরধ্বনি, দূরের গো-চারণের মাঠে রাখালের তলতা বাঁশের বাঁশীর সুর, সামনে উদাস মাঠের বুকে হাটুরে পথিকের পায়ের চলা পথ ; মনে হচ্ছিল— 'হারামণির গান যদি শুনতে হয়, তা হলে এমনি নিরালা একটু স্থান খুঁজে নিতে হয়। সাথে থাকবে এমনি 'একতারা'র মত অপ্রখর নদী-স্রোতের মৃদুল গুঞ্জন।"

৬. উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে তিন দিক থেকে রবীন্দ্র-বলয় ভেঙে নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এক. বাংলা কবিতায় বিদ্রোহাত্মক চেতনার স্ফূরণ ; দুই. গানের কথা ও সুরে বৈচিত্র্য আনয়ন ; তিন. বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ। সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারে তিনি ছিলেন সচেতন এবং দক্ষ শিল্পীর মত গদ্যে স্টাইল পরিবর্তনের সঙ্গে কবিতায় শব্দের অর্থগত পরিবেশ অনুযায়ী ব্যবহার, ধ্বনি সচেতনতা, ধ্বনিব্যঞ্জনার সার্থক রূপায়ণ, তাঁকে একজন সচেতন ভাষাশিল্পী হিসাবে চিহ্নিত করে। ভাব ও ভাষার এই হার্দ্য গুণ তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনাকে রূপমুগ্ধ শিল্পীর আসন দিয়েছে।